বদলে যাচ্ছে নাগরিক জীবন বাড়ছে অ্যাপার্টমেন্টের চাহিদা

তৈরি ফ্ল্যাটের প্রতি মধ্যবিত্ত তরুণ দম্পতিদের আগ্রহ বাড়ছে। আর তাই মধ্যবিত্ত পরিবারের সামর্থ্যকে সামনে রেখে ডেভেলপাররা নিচ্ছেন ক্রয় সামর্থ্যের সামঞ্জস্যে বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট। নাগরিক জীবনধারার পরিবর্তন উৎসাহিত করছে বর্তমান রিয়েল এস্টেট ব্যবসাকে ... লিখেছেন- **শাহরিয়ার ইকবাল রাজ**

কর্মজীবন শেষে অবসর জীবন শুরু করেছেন কাসেম সাহেব তিন বছর হলো। মোটামুটি সচ্ছল কর্মজীবনে দু'ছেলে রফিক ও করিমকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো সম্ভব হয়েছিল। পরিবারের হাল এখন তাদেরই ঘাড়ে। ছেলেদের দু'জনই এক্সিকিউটিভ লেভেলের চাকরি করছেন। কাসেম সাহেবের অনেক স্বপ্নের মাঝে সন্তানদের ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও ছিল ঢাকা শহরে মাথাগোঁজার ছোট্ট একটি নিজস্ব ঠিকানা তৈরি করা। আর তাই পঞ্চাশের শেষে মগবাজারে ৩ কাঠার ছোট জমিতে শুরু করেছিলেন ঠিকানা নির্মাণের কাজ। ছোট বাড়ি ১২০০-১৪০০ স্কয়ার ফিটের, পরিকল্পনা ও নির্মাণের শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছিলেন একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আজম। বাড়ির শক্ত ভিত তৈরির পাশাপাশি ভবিষ্যতে পাঁচতলা করা যায় এমনি ফাউন্ডেশন দেবার পরামর্শ পেয়েছিলেন কাসেম সাহেব। কিন্তু শক্ত ভিত পাঁচতলা করার উপযোগী হলেও স্বল্প সঞ্চয়ে তিন তলার বেশি করা সম্ভব হয়নি। ছেলেদের প্রায়ই বলতেন, 'বাকি বাড়ির কাজ তোরাই শেষ করবি'। তার স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণ করার সময়ই বুঝতে পারছিলেন ব্লাড প্রেসারে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটছে, যা পরবর্তীতে নানা রোগের উপসর্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। তার পরও যখন দক্ষিণার ছোট খোলা বারান্দায় অবসর সময়ে বসতেন, তখন 'নিজের বাড়ির আঙ্গিনায় বসে আছেন' ভাবতেই আত্মতৃপ্তির আস্বাদ পেতেন।

তার ছেলেরা বড় হয়েছেন, উপার্জন মধ্যবিত্ত অনুসারে যথেষ্ট। অথচ কেউই বাড়ির বাকি কাজ শেষ করতে আগ্রহী হচ্ছেন না। বরং তারা বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র সরে যাবার পরামর্শই দিচ্ছেন বাবাকে। কাসেম সাহেব প্রথমটাতে অন্যভাবে নিলেও ইদানীং পত্রপত্রিকায় নানা রকম বিজ্ঞাপনে তৈরি আবাসন অথবা প্লটের প্রচারণা দেখে বুঝতে পারেন, পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। 'স্বপ্নের ঠিকানা' খুঁজতে নানা উপায়ের কথাই এই বিজ্ঞাপনগুলো বলছে।

কাসেম সাহেবের মতো ঢাকা শহরে অনেকেই তাদের তারুণ্যের সময়ে ইস্পাহানী অথবা ইস্টার্নের উদ্যোগে প্রাইভেট হাউজিং প্রজেক্ট দেখেছেন কিন্তু উপলব্ধি করতে পারেননি যে ভবিষ্যতে আবাসন তৈরি ব্যবসার সূর্যোদয় তারা দেখবেন।

‘লো ইনকাম হাউজিংয়ে বিশ্বের অনেক দেশেই দেখা গেছে তারা তাদের নিজস্ব রিসোর্সকে কাজে লাগিয়ে আবাসন সমস্যার সমাধান করতে পারেন’

ড. মাহবুবুর রহমান
স্থাপত্য অনুষদ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

সাপ্তাহিক ২০০০ : আজকাল অনেক পরিবারই ফ্ল্যাট কেনার ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছোট স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের ক্রেতাও বাড়ছে। আপনার দৃষ্টিতে এটা কিভাবে দেখছেন?

ড. মাহবুব : ষাট শতকের মাঝামাঝি থেকে বেসরকারি পর্যায়ে আবাসন নির্মাণ শুরু হয়েছিল। তখন হয়তো হাউজিং ক্রাইসিস এই পর্যায়ে ছিল না। বর্তমান হাউজিং ক্রাইসিস আছে। এর ফলে ডেভেলপাররাও নানা ধরনের কন্‌সেপ্ট নিয়ে ফ্ল্যাট তৈরি করছেন। যার পুরোটাই হয়তো তারা করছে ব্যবসায়িক স্বার্থের দিক থেকে। প্রথমদিকে যারা ফ্ল্যাট কিনতেন তাদের অনেকেই সেকেন্ড বাড়ি হিসেবেই কিনতেন, আবার অন্য একটি গ্রুপ ‘প্রেসটিজের’ কথা চিন্তা করে গুলশানসহ বিভিন্ন অভিজাত এলাকায় কিনতো। অর্থাৎ প্রথম দিকে হাউজিং ক্রাইসিসের জন্য মানুষ ফ্ল্যাট কিনতো না। কিন্তু এখন ফ্ল্যাট কেনার কারণ দু’রকম, একটি হচ্ছে ল্যাক অব এফোর্ডিবিলিটি, আরেকটি ল্যাক অব ল্যান্ড এবং ল্যান্ড প্রাইস। এই প্রধান কারণগুলো ছাড়াও ক্রেতাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং সামর্থ্যের মাঝে ফ্ল্যাট তৈরির উদ্যোগ নেয়াটাকে বিচার করলেই ফ্ল্যাট কেনার ব্যাপারে নাগরিক আগ্রহ বোঝা যাবে।

২০০০ : এফোর্ডিবিলিটি বাড়ানো বলতে আপনি কোন দিকগুলোকে নির্দেশ করছেন?

ড. মাহবুব : এফোর্ডিবিলিটি বাড়ানোর বিভিন্ন উপায় আছে, হাউজিং লোনের ব্যবস্থা করা, হায়ার পার্সেস ইত্যাদি পলিসি নেয়া। আর অপরটি হচ্ছে ক্রয়ক্ষমতার মাঝে বিভিন্ন ইনোভেটিভ প্ল্যানিং, নির্মাণসামগ্রী ও জমি নির্ধারণের মাধ্যমে কম মূল্যে ফ্ল্যাট তৈরি করা। এসব দিক চিন্তা করেই ২০০৩ হাউজিং পলিসিতে হাউজিং ফিন্যান্সের ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২০০০ : আপনি মনে করেন ক্রেতাদের মাঝে ছোট স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের আগ্রহ বাড়ছে?

ড. মাহবুব : এটা অবশ্যই মার্কেট স্টাডির ব্যাপার। তবে ছোট ফ্ল্যাটের ডিমান্ড থাকলে ডেভেলপাররা অবশ্য তা তৈরি করবেন। এই মুহূর্তে এটা বলা সম্ভব যে বড় এক্সপেন্সিভ ফ্ল্যাটের ক্রেতাদের সংখ্যা আগের চাইতে কমে গেছে। এখন অনেক ডেভেলপারই তো ৮-৯ লাখ টাকায় ফ্ল্যাট দেবার প্রমিজ করছেন। এরা অবশ্য ছোট ফ্ল্যাট নয় বরং পরিপূর্ণ একটি পরিবারের চাহিদা মেটানোর মতো আবাসনই

আবাসন তৈরি বর্তমানে কোনো একক ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের সাময়িক উদ্যোগ নয় বরং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা। এর ফলে গড়ে মাত্র দু’বছরে অধিকাংশ ছয়তলা বাড়ির নির্মাণকাজ শেষ করা সম্ভব হচ্ছে। ১৯৯০-র দিকে ব্যবসাটি ‘রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রি’ হিসেবেই স্বীকৃত পায়। দশ-পনেরো বছর আগে একটি অথবা দুটি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত উদ্যোগে আবাসন নির্মাণ শুরু করলেও বর্তমানে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০০-র অধিক। প্রাথমিকভাবে সিবিডি (সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক) মতিঝিলের মতো এলাকার কাছাকাছি ইস্টার্ন হাউজিং প্রজেক্ট শুরু করলেও বর্তমানে তা ধানমন্ডি, গুলশান এমনকি উত্তরায়ও ছড়িয়ে গেছে। কেবল তাই নয়, চট্টগ্রাম এবং সিলেটেও অনেক উৎসাহী ডেভেলপার প্রজেক্ট নিচ্ছেন।

এ ধরনের ডেভেলপাররা মূলত ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য আগ্রহী করে তুলছেন রাজধানী শহরের নাগরিকদের। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ঢাকায় যে পরিমাণ আবাসন সমস্যা আছে, সরকারি উদ্যোগের চাইতে এ ধরনের ডেভেলপারদের উদ্যোগের ভূমিকাই সমস্যা নিরসনে অনেক গুণ সহায়ক হচ্ছে। কিছুটা গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখা যায়, মধ্যবিত্ত পরিবারের চাইতে উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মাঝেই জমি কিনে বাড়ি বানানো সম্ভব হচ্ছিল বেশি। আর রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রির কারণে বর্তমানে মধ্যবিত্তরাও নিজস্ব ঠিকানা খুঁজে নেবার প্র্যাকটিক্যাল স্বপ্ন দেখতে পারছেন। অবশ্য এর পাশাপাশি নাগরিক প্রয়োজন ও সামাজিক পর্যায়ে বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয়। মধ্যবিত্ত সমাজে যৌথ পরিবার অনেক ক্ষেত্রেই আর থাকছে না। ফলে তৈরি হচ্ছে অনেক নিউক্লিয়াস পরিবার। আর এদের পারিবারিক প্রয়োজনটাও স্বভাবতই আগের চাইতে পরিবর্তিত হচ্ছে। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নারীই বর্তমানে চাকরি না করলেও চিন্তা করছেন সাংসারিক কাজের বাইরে একটা কিছু করতে। এর প্রমাণ মেলে ঢাকা শহরে গড়ে ওঠা অসংখ্য বুটিক শপ থেকে। কেবল তাই নয়, যেহেতু সরকারি চাকরি দেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শতকরা হারে তেমন ভূমিকা রাখছে না, তাই বেসরকারি অথবা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরিজীবীর সংখ্যা বাড়ছে। চাকরি ক্ষেত্রে দেখা যায় বয়সের চাইতে অভিজ্ঞতা প্রধান এবং ক্রমশই রিটায়ার্ডমেন্টের ধারণা কিছুটা পাল্টে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, বেসরকারি চাকরির ব্যস্ততা সরকারি চাকরি থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বেশি। ‘সিনসিয়ারিটি’ শব্দের জোরালো প্রয়োগ সেখানেই বেশি দেখা যায়। সামগ্রিক দিকগুলো পর্যালোচনা করলে কতগুলো সুনির্দিষ্ট দিক বর্তমান রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রির প্রসারের কারণ প্রতীয়মান হয়। সেগুলো হচ্ছে-

* বর্তমান পারিবারিক ও সামাজিক পরিবর্তন
* হয়তো নিউক্লিয়াস ফ্যামিলির সংখ্যা বৃদ্ধি
* এক্সিকিউটিভ লেভেলে নতুন এডুকেটেড তরুণদের চাকরির সুবিধা
* মহিলাদের শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি পরিবারের বাইরেও অন্য কিছু করার আগ্রহ
* বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জোরালো রিয়েল এস্টেট মার্কেটিং
* সর্বোপরি রিয়েল এস্টেট বিজনেসের ক্রেতা সুবিধা ও কমিটমেন্টের মতো স্পর্শকাতর দিকগুলোর প্রতি সুনির্দিষ্ট নজর দেয়া

এসব কারণ কিন্তু পাল্টে দিচ্ছে বৃদ্ধ বয়সে বাড়ি তৈরির প্রজেক্ট নেবার মতো

তরুণদের মাঝেও আগ্রহ বাড়াচ্ছে ফ্ল্যাট কেনার। আজকাল প্রতি বছরই ঢাকা শহরে কমপক্ষে দু’ থেকে তিনটি বাড়ি বিক্রির মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। এর প্রতিটিতেই তরুণ দম্পতিদের ভিড় বেশ লক্ষণীয়। মানুষের মাঝে বোধহয় চেতনার জন্ম হচ্ছে, যা থেকে তারা নির্ধারণ করতে পারছেন বাড়ির স্কয়ারফিট হওয়া উচিত প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূণ..

ডিজাইন করছেন।

২০০০ : 'হাউজিং নিড' তো ক্রমশই বাড়ছে। সে ক্ষেত্রে কোন ধরনের ফ্ল্যাটের প্রতি ক্রেতারা আগ্রহী হবেন...

ড. মাহবুব : 'হাউজিং নিড' শব্দটাকে আসলে এফেকটিভ 'হাউজিং নিড' হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত। এতে করে কোনো কোনো ইনকাম গ্রুপের জন্য কতোগুলো বাড়ি এবং কোন এলাকায় তা দরকার তা ডিটারমাইন করা সম্ভব হবে। এ থেকেই বের করা যাবে, আসলেই কোন স্কয়ার ফিট, কতো ফ্ল্যাটের ডিমান্ড আছে।

২০০০ : গভর্মেন্ট হাউজিংয়ে পারিবারিক প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে বাসা দেবার চেয়ে, বেতনের ওপরই স্কয়ার ফিট নির্ভর করে...

ড. মাহবুব : এখানে আসলে দু'টি নীতি কাজ করে। একটি হলো সরকারি হাউজিং নীতি অর্থাৎ আর বড় বেতন বড় বাড়ি। আসলে সরকারি ফ্ল্যাট বাড়ির পুরো ব্যাপারটাই কস্ট ইফিকটিভ না, বরং সরকারি কর্মজীবীদের একটা প্রিভিলেজ। যা আবার সবাই পান না, অনেকবারই বিভিন্ন পাঁচশালা পরিকল্পনায় হাউজিং প্ল্যানে হায়ার পারচেজ সিস্টেমে বরাদ্দ দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। যাতে করে, সরকারি বাসভবনের পরিচর্যা ও তৈরি খরচের একটা অংশ আদায় করে নেয়া সম্ভব হতো। যা কেবল বেতনের স্বল্পাংশ থেকে সম্ভব নয়।

২০০০ : সব শ্রেণীর জন্য আবাসন তৈরি করার উদ্যোগ আমরা কিভাবে নিতে পারি।

ড. মাহবুব : অবশ্যই এ উদ্যোগ নেয়া সম্ভব। লো ইনকাম হাউজিংয়ে বিশ্বের অনেক দেশেই দেখা গেছে তারা তাদের নিজস্ব রিসোর্সকে কাজে লাগিয়ে আবাসন সমস্যার সমাধান করতে পারেন। সকলের সমস্যার সমাধান সরকারের একার নয়। এতে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উভয়কেই পরিপূরক ভূমিকা নিতে হবে। সরকার নিয়মনীতি, তহবিল, সার্ভিস ও অবকাঠামো যোগান দেবে আর বেসরকরি উদ্যোক্তারা এসব সুবিধা নিয়ে আবাসন তৈরি করবে।

২০০০ : ইদানীংকালে আমরা ঢাকা বিকেন্দ্রীকরণ হলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

ড. মাহবুব : আসলে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটা অনেক পুরনো। এর মধ্যে আছে স্যাটেলাইট টাউন যার সঙ্গে বিকেন্দ্রীকরণের সম্পর্ক ক্ষীণ। কেননা এটা হচ্ছে এমন একটি ডেভেলপমেন্ট যেখানে মূলত শহর থেকে দূরে পরিবারসহ সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সমন্বয়ে হাউজিং গড়ে উঠতে পারে। অবশ্যই সেই এলাকার সঙ্গে শহরের কর্মস্থলের সুন্দর যোগাযোগ না থাকলে তা সফল হবে না। এ ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট টাউন বলতে এর মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগের কথা বলা হয় না। অপরদিকে বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে কলকারখানা, অফিস-আদালতকে বর্তমান অবস্থান থেকে শহরের বাইরে সরিয়ে নেয়া। যেখানে মানুষ আবাসন তৈরি করবে কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে।

কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের আগের পদক্ষেপগুলো ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ সরকারিভাবে আমরা কেন্দ্র স্থিতিশীল নীতি অনুকরণ করতে

ঘটনাকে। বরং তরুণদের মাঝেও আগ্রহ বাড়াচ্ছে ফ্ল্যাট কেনার। আজকাল প্রতি বছরই ঢাকা শহরে কমপক্ষে দু' থেকে তিনটি বাড়ি বিক্রির মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। এর প্রতিটিতেই তরুণ দম্পতিদের ভিড় বেশ লক্ষণীয়। মানুষের মাঝে বোধহয় চেতনার জন্ম হচ্ছে, যা থেকে তারা নির্ধারণ করতে পারছেন বাড়ির স্কয়ারফিট হওয়া উচিত প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর লোকেশনও হতে হবে সামর্থ্যের কাছাকাছি। অধিকাংশ ফ্ল্যাটের সঙ্গে পার্কিং থাকার কারণে গাড়ি কেনার ব্যাপারেও অনেকে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। আর এর পাশাপাশি ড্রাইভার না রেখে নিজে চালালে যে সামার্থ্যের মাঝেও সমতা রেখে চলা সম্ভব তা বুঝতে পারছেন অনেকেই। আজকাল অনেক বাড়িতেই আর লোহার তৈরি বটি দেখা যায় না। বরং দেখা যায় ধারালো স্টেইনলেসের ছুরি আর দাঁড়িয়ে কিচেনে রান্না করা। অ্যাপার্টমেন্টের সুবাদে অনেক পরিবারেই থাকছে সুনির্দিষ্ট ফ্যামিলি লিভিং আর ছিমছাম ড্রইং রুম। বাড়ির নিরাপত্তা বিধানে থাকছে সার্বক্ষণিক পোশাক পরা দারোয়ান। যেহেতু সবাই ফ্ল্যাটের মালিক, সেহেতু এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিচ্ছেন নিজেদের মাঝ থেকে নির্বাচিত একজন। অনেকটা সমবায় ধারণার মতোই।

কিন্তু জীবন যাত্রার এই ভিন্ন ধারণার পাশাপাশি অ্যাপার্টমেন্ট জীবনে কিছু অসুবিধাও থাকছে। প্রথমত আসে শিশুদের খেলার জায়গার স্বল্পতা। আবার অনেকেই মনে করেন অ্যাপার্টমেন্ট জীবনে যান্ত্রিকতাই বেশি। অবশ্য এ ধরনের যুক্তি-তর্কের কারণেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারি যৌথ উদ্যোগে হচ্ছে নতুন ইমারত নির্মাণ আইন, যেখানে উন্মুক্ত জায়গার কথা বলা হয়েছে বেশ জোরালোভাবে।

রাজধানীসহ বেশ কিছু নগরীতে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মাঝে ফ্ল্যাট বাড়ি ক্রয় করার আগ্রহ বাড়ছে আর তাই বেসরকারি ও সরকারি পর্যায়ে উচিত এই আগ্রহ সামনে রেখে ক্রেতা তৈরি করার জন্য বিভিন্নভাবে ক্রেতাদের সামর্থ্যকে বাড়ানো যার মাধ্যমগুলো হতে পারে সহজ শর্তে ঋণ, হাইয়ার পার্চেজ পলিসি ইত্যাদি। যদিও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বেশ কটি প্রতিষ্ঠান ঋণ সুবিধা দিচ্ছে। সরকারি পর্যায়েও এর উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ সামগ্রীর বাজার অনেক সময়ই ক্রেতাদের উৎসাহে সমস্যা করে থাকে, যা সরকারি পর্যায়ে নীতিনির্ধারণের মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব।

সর্বোপরি, নানা সমস্যার মাঝ দিয়েও বর্তমান রিয়েল এস্টেট একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা। ব্যবসায়িক কারণে হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণে, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কৃতিত্বই এতে বেশি। বর্তমানে বাড়ি নির্মাণের চাইতে ফ্ল্যাট ক্রয়ের আগ্রহ নাগরিকদের মাঝে বাড়ছে। শহরের চাইতে অনেক দূরে যেমন- গাজীপুর, আশুলিয়া ইত্যাদি জায়গায়ও আজকাল মানুষ জমি কিনতে আগ্রহী হচ্ছেন, যার অধিকাংশই বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দ্বারা তৈরিকৃত প্লট।

রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রির কারণে বর্তমানে মধ্যবিত্তরাও নিজস্ব ঠিকানা খুঁজে নেবার প্র্যাকটিক্যাল স্বপ্ন দেখতে পারছেন। অবশ্য এর পাশাপাশি নাগরিক প্রয়োজন ও সামাজিক পর্যায়ে বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয়। মধ্যবিত্ত সমাজে যৌথ পরিবার অনেক ক্ষেত্রেই আর থাকছে না

সবকিছুর পরও ঢাকা হয়ে উঠছে যানবাহনবহুল। দক্ষিণা বারান্দা থাকলেও একচিলতে আকাশ দেখা অথবা বাতাস পাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গাঁ ঘেষে তৈরি হওয়া আরেকটি ফ্ল্যাট বাড়ি। ধানমন্ডি অথবা গুলশানে নির্মাণকাজের কারণে অধিকাংশ রাস্তায় ধুলির ঝড়। সুস্থ বসবাসের জীবন শুধু ফ্ল্যাট বাড়ির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

চার দেয়াল তৈরিতে ব্যস্ততা কমিয়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরিতে আরো বেশি আগ্রহী হতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টাই নাগরিক সুবিধা দিতে পারে, আর সেই সঙ্গে রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসায়িক দিকগুলোও আরো লাভবান হয়ে উঠতে পারে।